Einstein

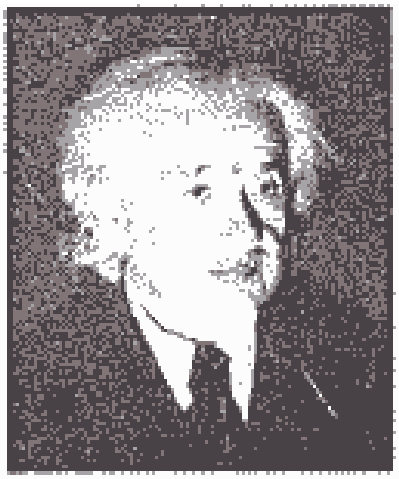

আলবার্ট আইনস্টাইন

(১৮৭৯–১৯৫৫)

জার্মানীর একটি ছোট শহর উলমে এক সম্পন্ন ইহুদী পরিবারে আইনস্টাইনের জন্ম (১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ)।
পিতা ছিলেন ইনজিনিয়ার। মাঝে মাঝেই ছেলেকে নানা খেলনা এনে দিতেন।

শিশু আইনস্টাইনের বিচিত্র চরিত্রকে সেই দিন উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি তাঁর অভিভাবক, তাঁর শিক্ষকদের। স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝেই অভিযোগ আসত। পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়া ছেলে, অমনোযোগী আর একলা। ক্লাসের কেউ তাঁর সঙ্গী ছিল না। সকলের শেষে পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতেন।

শুধু তাঁর একমাত্র সঙ্গী তাঁর মা। তাঁর কাছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নানান সুর গাইতেন। আর বেহালায় সেই সুর তুলে নেন। এই বেহালা ছিল আইনস্টাইনের আজীবন কালের সাথী। বাবাকে বড় একটা কাছে পেতেন না আইনস্টাইন। নিজের কারখানা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন তিনি। আনন্দেই কাটছিল তাঁর জীবন।

সেই আনন্দে ভরা দিনগুলোর মাঝে হঠাৎ কালো ঘনিয়ে এল। সেই শৈশবেই আইনস্টাইন প্রথম অনুভব করলেন জীবনের তিক্ত স্বাদ। তাঁরা ছিলেন ইহুদী। কিন্তু স্কুলে ক্যাথলিক ধর্মের নিয়মকানুন মেনে চলতে হত।

স্কুলের সমস্ত পরিবেশটাই বিস্বাদ হয়ে যায় তাঁর কাছে। দর্শনের বই তাঁকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করত। পনেরো বছর বয়েসের মধ্যে তিনি কান্ট, স্পিনোজা, ইউক্লিড, নিউটনের রচনা পড়ে শেষ করে ফেললেন। বিজ্ঞান, দর্শনের সাথে পড়তেন, গ্যেটে, শিলার, শেকসপীয়ার। অবসর

সময়ে বেহালার ছড়ে বিঠোফেন, মোৎসার্টের সুর তুললেন। এরাই ছিল তাঁর সঙ্গী বন্ধু তাঁর জগৎ।

এই সময় বাবার ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিল। তিনি স্থির করলেন মিউনিখ ছেড়ে মিলানে চলে যাবেন। তাতে যদি ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। সকলে মিউনিখ ত্যাগ করল, শুধু সেখানে একা রয়ে গেলেন আইনস্টাইন।

সুইজারল্যাণ্ডের একটি পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হলেন। প্রথমবার তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় পরীক্ষায় পাশ করলেন।

বাড়ির আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে আসছে। আইনস্টাইন অনুভব করলেন সংসারের দায়-দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে। শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করবার জন্য তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিত নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে শিক্ষকতার জন্য বিভিন্ন স্কুলে দরখাস্ত করতে আরম্ভ করলেন। অনেকের চেয়েই শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর বেশি ছিল কিন্তু কোথাও চাকরি পেলেন না। কারণ তাঁর অপরাধ তিনি ইহুদী।

নিরুপায় আইনস্টাইন খরচ চালাবার প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র পড়াতে আরম্ভ করলেন। এই সময় আইনস্টাইন তাঁর স্কুলের সহপাঠিনী মিলেভা মারেককে বিয়ে করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২। মিলেভা শুধুমাত্র আইনস্টাইনের স্ত্রী ছিলেন না, প্রকৃত অর্থেই তাঁর জীবনসঙ্গী ছিলেন।

আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন শিক্ষকতার কাজ পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। একটি অফিসে ক্লার্কের চাকরি নিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের খাতার পাতায় সমাধান করতেন অঙ্কের জটিল তত্ত্ব। স্বপ্ন দেখতেন প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করবার। তাঁর এই গোপন সাধনার কথা শুধুমাত্র মিলেভাকে বলেছিলেন, "আমি এই বিশ্বপ্রকৃতির স্থান ও সময় নিয়ে গবেষণা করছি।"

আইনস্টাইনের এই গবেষণায় ছিল না কোন ল্যাবরেটরি, ছিল না কোন যন্ত্রপাতি। তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল খাতা-কলম আর তাঁর অসাধারণ চিন্তাশক্তি।

অবশেষে শেষ হল তাঁর গবেষণা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬। একদিন ত্রিশ পাতার একটি প্রবন্ধ নিয়ে হাজির হলেন বার্লিনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা "Annalen der physik"-এর অফিসে।

এই পত্রিকায় ১৯০১ থেকে পর্যন্ত আইনস্টাইন পাঁচটি রচনা প্রকাশ করলেন। এই সব রচনায় প্রচলিত বিষয়কে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে আইনস্টাইনের নাম বিজ্ঞানীমহলে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কোন সুরাহা হল না। নিতান্ত বাধ্য হয়ে বাড়িতে ছাত্র পড়াবার কাজ নিলেন।

একদিকে অফিসের কাজ, মিলেভার স্নেহভরা ভালবাসা, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা—অবশেষে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হল তাঁর চারটি রচনা—প্রথমটি আলোর গঠন ও শক্তি সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি এটমের আকৃতি প্রকৃতি। তৃতীয়টি ব্রাউনিয়াম মুভমেন্টের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব। চতুর্থটি তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত করল। এই আপেক্ষিকতা বলতে বোঝায় কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ বা অন্য কিছুর তুলনা। আইনস্টাইন বললেন, আমরা যখন কোন সময় বা স্থান পরিমাপ করি তখন আমাদের অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে হবে। তিনি বলেছেন আলোক বিশ্বজগৎ, কাল এবং মাত্রা আপেক্ষিক।

আমাদের মহাবিশ্বে একটি মাত্র গতি আছে যা আপেক্ষিক নয়, অন্য কোন গতির সঙ্গেও এর তুলনা হয় না—এই গতি হচ্ছে আলোকের গতি। এই গতি কখনই পরিবর্তন হয় না।

এই সময় জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ জানানো হল। আইনস্টাইনকে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেবার জন্য। ১৯০৭ সালে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হলেন। এরই সাথে পেটেন্ট অফিসের চাকরিও করেন।

বিজ্ঞান জগতে ক্রমশই আইনস্টাইনের নাম ছড়িয়ে পড়ছিল। বিজ্ঞানী কেলভিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানানো হল। এখানে তাঁকে

অনারারি ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হল। এর পর তাঁর ডাক এল জার্মানীর সলসবার্গ কনফারেন্স থেকে। এখানে জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সামনে তাঁর প্রবন্ধ পড়লেন আইনস্টাইন। তিনি বললেন, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এমন কোন এক তত্ত্ব পাব যা আলোর কণাতত্ত্ব এবং তরঙ্গ তত্ত্বকে সময়ের বাঁধনে বাঁধতে পারবে।

আইনস্টাইনের এই উক্তির জবাবে বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক বললেন, আইনস্টাইন যা চিন্তা করছেন সেই পর্যায়ে চিন্তা করবার সময় এখনো আসেনি।

এর উত্তরে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের $E=mc^2$ উৎপত্তিটি আলোচনা করে বোঝালেন তিনি যা প্রমাণ করতে চাইছেন তা কতখানি সত্য।

১৯০৮ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার পদ সৃষ্টি করা হল। রাজনৈতিক মহলের চাপে এই পদে মনোনীত করা হল আইনস্টাইনের সহপাঠী ফ্রেডরিখ এডলারকে। ফ্রেডরিখ নতুন পদে যোগ দিয়েই জানতে পারলেন এই পদের জন্য আইনস্টাইনের পরিবর্তে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি কর্তৃপক্ষকে জানালেন এই পদের জন্য আইনস্টাইনে চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই। তার তুলনায় আমার জ্ঞান নেহাতই নগণ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও উপলব্ধি করতে পারলেন ফ্রেডরিখের কথার গুরুত্ব। অবশেষে ১৯০৯ সালে আইনস্টাইন তার পেটেন্ট অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করলেন। জুরিখে এসে বাসা ভাড়া করলেন।

আইনস্টাইন আর কেরানী নন, প্রফেসর। কিন্তু মাইনে আগে পেতেন ৪৫০০ ফ্রাঙ্ক, এখনো তাই। তবে লেকচার ফি বাবদ সামান্য কিছু বেশি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ বহু মানুষের সাথে, গুণী বিজ্ঞানীদের সাথে পরিচয় হয়। এমন সময় ডাক এল জার্মানীর প্রাগ থেকে। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে তাঁকে নিয়োগপত্র দেওয়া হল। মাইনে আগের চেয়ে বেশি। তাছাড়া প্রাগে গবেষণার জন্যে পাবেন বিশাল লাইব্রেরী। ১৯১১ সালে সপরিবারে প্রাগে এলেন আইনস্টাইন। কয়েক মাস আগে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়েছে।

অবশেষে দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত জুরিখের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক এল আইনস্টাইনের। ১৯১২ সালে প্রাগ ত্যাগ করে এলেন জুরিখে। এখানে তখন ছুটি কাটাতে এসেছিলেন মাদাম, কুরী, সঙ্গে দুই কন্যা। দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে গড়ে উঠল মধুর বন্ধুত্ব। পাহাড়ি পথ ধরে যেতে যেতে মাদাম কুরী ব্যাখ্যা করেন তেজস্ক্রিয়তা আর আইনস্টাইন বলেন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। একদিন নিজের তত্ত্বের কথা বলতে বলতে এত তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন, পথের ধারে গর্তের মধ্যে পড়িয়ে পড়লেন আইনস্টাইন। তাই দেখে মেরী কুরীর দুই মেয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল। গর্ত থেকে উঠে তাদের সঙ্গে আইনস্টাইনও হাসিতে যোগ দিলেন।

সেই সময় জার্মানীতে কাইজারের পৃষ্ঠপোষকতায় বার্লিন শহরে গড়ে উঠেছে কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিটিউট। বিজ্ঞানের এতবড় গবেষণাগার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে যোগ দিয়েছেন প্লাঙ্ক, নার্নস্ট, হাবের আরো সব বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। কিন্তু আইনস্টাইন না থাকলে যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সব কিছু। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হল।

বার্লিনে এলেন আইনস্টান। সব কিছু দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। শুধু গবেষণাগার নয়, বহু বিজ্ঞানীকেও কাছে পাওয়া যাবে। একসাথে কাজ করা যাবে। তাঁকে মাইনে দেওয়া হল বর্তমান মাইনের দ্বিগুণ।

১৯১৪ সালে বার্লিনে এলেন আইনস্টাইন। যখন আইনস্টাইন বার্লিন ছেড়েছিলেন তখন তিনি পনেরো বছরের কিশোর। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর ফিরে এলেন নিজের শহরে। চেনা-জানা পরিচিত মানুষদের সাথে দেখা হল। সবচেয়ে ভাল লাগল দূর সম্পর্কিত বোন কাছে ফিরে এসেছে। এলসার সান্নিধ্য বরাবরই মুগ্ধ করত আইনস্টাইনকে। অল্পদিনেই অনেকের সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

ছেলেবেলা থেকেই যেখানে সেখানে অঙ্ক করার অভ্যেস ছিল আইনস্টাইনের। কখনো ঘরের মেঝেতে, কখনো টেবিলের উপর। টেবিল ভর্তি হয়ে গেলে মাটিতে বসে চেয়ারের উপরেই অঙ্ক কষে চলেছেন।

গবেষণায় যতই মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন আইনস্টাইন, সংসারের প্রতি ততই উদাসীন হয়ে পড়ছিলেন। স্ত্রী মিলেভার সাথে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। ক্রমশই সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন মিলেভা। দুই ছেলেকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে চলে গেলেন। কয়েক মাস কেটে গেল আর ফিরলেন না মিলেভা।

এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হল। বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই জড়িয়ে পড়লেন যুদ্ধে। আইনস্টাইন এই যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে ব্যথিত হলেন। এরই সাথে সংসারের একাকিত্ব, স্ত্রী পুত্রকে হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন আইনস্টাইন।

এই সময় অসুস্থ আইনস্টাইনের পাশে এসে দাঁড়ালেন এলসা। এলসার অক্লান্ত সেবা-যত্নে ক্রমশই সুস্থ হয়ে উঠলেন আইনস্টাইন।

তিনি স্থি'র করলেন মিলেভার সাথে আর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব নয়। অবশেষে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। আইনস্টাইন এলসাকে বিয়ে করলেন।

এদিকে যুদ্ধ শেষ হল। কাইজারের পতন ঘটল। প্রতিষ্ঠা হল নতুন জার্মান রিপাবলিকের।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব তখনো প্রমাণিত হয়নি। এগিয়ে এলেন ইংরেজ বিজ্ঞানীরা। সূর্যগ্রহণের একাধিক ছবি তোলা হল। সেই ছবি পরীক্ষা করে দেখা গেল আলো বাঁকে।

বিজ্ঞানীরা উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। মানুষ তাঁর জ্ঞানের সীমানাকে অতিক্রম করতে চলেছে। অবশেষে ৬ই নভেম্বর ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটিতে ঘোষণা করা হল সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার, আলো বেঁকে যায়। এই বাঁকের নিয়ম নিউটনের তত্ত্বে নেই। আলোর বাঁকের মাপ আছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রে।

পরিহাসপ্রিয় আইনস্টাইন তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়ে কৌতুক করে বললেন, আমার আপেক্ষিক তত্ত্ব সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। এইবার জার্মানী বলবে আমি জার্মান আর ফরাসীরা বলবে আমি বিশ্বনাগরিক। কিন্তু যদি আমার তত্ত্ব মিথ্যা হত তাহলে ফরাসীরা বলত আমি জার্মান আর জার্মানরা বলত আমি ইহুদী।

একদিন এক তরুণ সাংবাদিক বললেন, আপনি সংক্ষেপে বলুন আপেক্ষিক তত্ত্বটা কি?

আইনস্টাইন কৌতুক করে বললেন, যখন একজন লোক কোন সুন্দরীর সঙ্গে এক ঘণ্টা গল্প করে তখন তার মনে হয় সে যেন এক মিনিট বসে আছে। কিন্তু যখন তাকে কোন গরম উনানের ধারে এক মিনিট দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তার মনে হয় সে যেন এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে। এই হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্ব।

আপেক্ষিক তত্ত্বে জটিলতার দুর্বোধ্যতার কারণে মুখরোচক কিছু কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল। একদিন এক সুন্দরী তরুণী তার প্রেমিকের সাথে চার্চের ফাদারের পরিচয় করিয়ে দিল। পরদিন যখন মেয়েটি ফাদারের কাছে গিয়েছে, ফাদার তাকে কাছে ডেকে বললেন, তোমার প্রেমিককে আমার সবদিক থেকেই ভাল লেগেছে শুধু একটি বিষয় ছাড়া।

মেয়েটি কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, কোন বিষয়? ফাদার বললেন, তার কোন রসবোধ নেই। আমি তাকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাস করেছি আর সে আমাকে তাই বোঝাতে আরম্ভ করল। হাসিতে ফেটে পড়ল মেয়েটি।

আমেরিকার এক বিখ্যাত সরকার জর্জ তাঁর এক বন্ধুকে বললেন, একজন মানুষ কুড়ি বছর ধরে একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করলেন, আর ভাবলে অবাক হতে হয় সেই চিন্তাটুকুকে প্রকাশ করলেন মাত্র তিন পাতায়। বন্ধুটি জবাব দিল, নিশ্চয়ই খুব ছোট অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।

আইনস্টাইন আমেরিকায় গিয়েছেন, সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরল। একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এক কথায় আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে পারেন? আইনস্টাইন জবাব দিলেন, না।

আজকাল মেয়েরা কেন আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে এত আলোচনা করছে? আইনস্টাইন হাসতে হাসতে বললেন, মেয়েরা সব সময়েই নতুন কিছু পছন্দ করে–এই বছরের নতুন জিনিস হল আপেক্ষিক তত্ত্ব।

অবশেষে এল সাধক বিজ্ঞানীর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কিছুদিন ধরেই নোবেল কমিটি আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা চিন্তা করছিল। কিন্তু সংশয় দেখা গেল স্বয়ং নোবেলের ঘোষণার মধ্যে। তিনি বলে গিয়েছিলেন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাবেন আবিষ্কারক আর সেই আবিষ্কার যেন মানুষের কল্যাণে লাগে। আইনস্টাইনের বেলায় বিতর্ক দেখা দিল তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব যুগান্তকারী হলেও প্রত্যক্ষভাবে তা মানুষের কোন কাজে লাগবে না।

তখন স্থির তাঁর ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বা আলোক তড়িৎ ফলকে সরাসরি আবিষ্কার হিসাবে বলা সম্ভব। এবং এর প্রত্যক্ষ ব্যবহারও হচ্ছে তাই ঘোষণা করা হল "Serfvice to the theory of Physics, especially for the Law of the Photo Electric Effect."

আইনস্টাইন তাঁর প্রথমা স্ত্রী মিলেভার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের শর্ত অনুসারে নোবেল পুরস্কারের পুরো টাকাটা তাঁকে পাঠিয়ে দেন।

আমেরিকায় বক্তৃতা দেবার জন্য বার বার ডাক আসছিল। অবশেষে ১৯৩০ সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন, সেখানে অভূতপূর্ব সম্মান পেলেন। শুধু আমেরিকা নয়, যখন যে দেশেই যান সেখানেই পান সম্মান আর ভালবাসা।

এদিকে স্বদেশ জার্মানী ক্রমশই আইনস্টাইনের কাছে পরবাস হয়ে উঠেছিল। একদিকে তাঁর সাফল্য স্বীকৃতিকে কিছু বিজ্ঞান, ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে অন্য দিবে হিটলারের আবির্ভাবে দেশ জুড়ে এক জাতীয়তাবাদের নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে একদল মানুষ। ইহুদীরা ক্রমশই ঘৃণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন জার্মানীতে থাকা তাঁর পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু কোথা যাবেন? আহ্বান আসে নানা দেশ থেকে। অবশেষে স্থির করলেন আমেরিকার প্রিন্সটনে যাবেন।

জার্মানী থেকে ইহুদী বিতাড়ণ শুরু হয়ে যায়। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন এইবার তাঁরও যাবার পালা। প্রথমে গেলেন ইংল্যান্ডে। সেখান থেকে ১৯৩৪ সালের ৭ই জুলাই রওনা হলেন আমেরিকায়। তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন।

প্রিন্সটনের কর্তৃপক্ষ আইনস্টাইনের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গুপ্তঘাতকের দল যে সাগর পেরিয়ে আমেরিকায় এসে পৌছবে না তাই বা কে বলতে পারে। তাই তাঁকে গোপন জায়গায় রাখা হল। সেই বাড়ির ঠিকানা কাউকে জানানো হল না। এইভাবে থাকতে তাঁর আর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে ল্যাবরেটরি থেকে এসে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। একদিন সন্ধ্যেবেলায় প্রিন্সটনের ডিরেকটরের বাড়িতে ফোন এল, দয়া করে যদি আইনস্টাইনের বাড়ির নম্বরটা জানান।

আইনস্টাইনের বাড়ির নম্বর কাউকে জানানো হল না বলে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন ডিরেকটার।

খানিক পরে আবার ফোন বেজে উঠল। আমি আইনস্টাইন বলছি, বাড়ির নম্বর আর রাস্তা দুটোই ভুলে গিয়েছি। যদি দয়া করে বলেন দেন।

এ এক বিচিত্র ঘটনা, যে মানুষটি নিজের ঘরের ঠিকানা মনে রাখতে পারেন না, তিনি বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের ঠিকানা খুঁজে বার করেন।

প্রকৃতপক্ষে জীবনের উত্তরপর্বে এসে আইনস্টাইন হয়ে উঠেছিলেন গৃহ সন্ন্যাসী। বড়দের চেয়ে শিশুরাই তাঁর প্রিয়। তাদের মধ্যে গেলে সব কিছু ভুলে যান। শিশুদের কাছে কল্পনার খ্রিস্টমাস বুড়ো। পরনে কোট নেই, টাই নেই, জ্যাকেট নেই। ঢলঢলে প্যান্ট আর গলা-আঁটা সোয়েটার, মাথায় বড় বড় চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঝ্যাটা গোঁফ।–দাড়ি কামাতে অর্ধেক দিন

ভুলে যান। যখন মনে পড়ে গায়ে মাখা সাবানটা গালে ঘষে দাড়ি কেটে নেন। কেউ জিজ্ঞেস করলে কি ব্যাপার গায়ে মাখা সাবান দিয়ে দাড়ি কাটা। আইনস্টাইন জবাব দিতেন, দু'রকম সাবান ব্যবহার করে কি লাভ।

শুধু নির্যাতিত ইহুদীদের সপক্ষে নয়, তিনি ক্রমশই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করছে, দলমত নির্বিশেষে তিনি তাদের সমর্থন করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একদিন মানুষ এই ধ্বংসের উন্মাদনা ভুলে এক হবেই। আর একত্বতার মধ্যেই মানুষ খুঁজে পাবে তার ধর্মকে।

আইনস্টাইনের কাছে এই ধর্মীয় চেতনা প্রচলিত কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্ম মানবতারই এক মূর্ত প্রকাশ। বিজ্ঞান আর ধর্মে কোন প্রভেদ নেই। প্রভেদ শুধু দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিজ্ঞান শুধু "কি" তার উত্তর দিতে পারে "কেন" বা "কি হওয়া উচিত" সে উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। অপর দিকে ধর্ম শুধু মানুষের কাজ আর চিন্তার মূল্যায়ন করতে পারে মাত্র। সে হয়ত মানব জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌছবার পথ বলে দেয় বিজ্ঞান।...তাই ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।

মানবতাবাদী আইনস্টাইন একদিকে শান্তির জন্যে সংগ্রাম করছিলেন অন্যদিকে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন একের পর এক তত্ত্ব আবিষ্কার করছিলেন। এই সময় তিনি প্রধানত অভিকর্ষ ও বিদ্যুৎ চৌম্বকক্ষেত্রের মিলন সাধনের প্রচেষ্টায় অতিবাহিত করেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিকাশের পথে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কিন্তু এই তত্ত্বের সম্ভাব্যতাভিত্তিক চরিত্রে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল না।

১৯৩৬ সালে হঠাৎ স্ত্রী এলসা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুদীর্ঘ ষোলো বছর ধরে এলসা ছিলেন আইনস্টাইনের যোগ্য সহধর্মিনী, তাঁর সুখ-দুঃখের সঙ্গী।

আইনস্টাইন সব বুঝতে পারেন কিন্তু অসহায়ের মত তিনি শুধু চেয়ে থাকেন। অবশেষে ১৯৩৬ সালে চিরদিনের মত প্রিয়তম আইনস্টাইনকে ছেড়ে চলে গেলেন এলসা। এই মানসিক আঘাতে সাময়িকভাবে ভেঙে পড়লেন আইনস্টাইন।

এই সময় পারমাণবিক শক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই শক্তির ভয়াবহতা সকলেই উপলব্ধি করতে পারছিলেন। পরীক্ষায় জানা গেল পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক ধাতু হল ইউরেনিয়াম। আর এই ইউরেনিয়াম তখন একমাত্র পাওয়া যায় কঙ্গো উপত্যকায়। কঙ্গো বেলজিয়ামের অধিকারভুক্ত। বিজ্ঞানী মহল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল যদি জার্মানদের হাতে এই ইউরেনিয়াম পড়ে তাহলে তারা পরমাণু বোমা বানাতে মুহূর্তে মাত্র বিলম্ব করবে না। গোপনে সংবাদ পাওয়া যায় জার্মান বিজ্ঞানীরা নাকি জোর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

আইনস্টাইন উপলব্ধি করলেন তাঁর সমীকরণ প্রমাণিত হতে চলছে। সামান্য ভরের রূপান্তরের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে অপরিমেয় শক্তি। আইনস্টাই লিখেছেন, "আমার জীবনকালে এই শক্তি পাওয়া যাবে ভাবতে পারিনি।"

এদিকে জার্মান বাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন যুদ্ধ জয় করতে গেলে এ্যটম বোমা তৈরি করা দরকার। এবং তা জার্মানীর আগেই তৈরি করতে হবে। সকলে সমবেতভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে আবেদন জানাল।

যদিও এই আবেদনপত্র সই করেছিলেন আইনস্টাইন, আমেরিকায় পরমাণু বোমা তৈরির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই তিনি জড়িত ছিলেন না।

শেষ দিকে তিনি চেয়েছিলেন এই গবেষণা বন্ধ হোক। তিনি বিজ্ঞানী মাক্স বোর্নকে বলেন, পরমাণু বোমা তৈরির জন্য আবেদনপত্রে আমার সই করাটাই সবচেয়ে বড় ভুল।

জাপানে এ্যাটম বোমা ফেলবার পর তার বিধ্বংসী রূপ দেখে বিচলিত আইনস্টাইন লিখেছেন, "পারমাণবিক শক্তি মানব জীবনে খুব তাড়াতাড়ি আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে—সে রকম

মনে হয় না। এই শক্তি মানবজাতির প্রকৃতই ভয়ের কারণ—হয়তো পরোক্ষভাবে তা ভালই করবে। ভয় পেয়ে মানবজাতি তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা চালু করবে। ভয় ছাড়া মানুষ বোধহয় কখনোই শান্তির পথে অগ্রসর হতে পারবে না।

১৯৫০ সালে প্রকাশিত হল তাঁর নতুন তত্ত্ব (A generalised theory of Gravitation)। মহাকর্ষের সর্বজনীন তত্ত্ব। এত জটিল সেই তত্ত্ব, খুব কম সংখ্যক মানুষই তা উপলব্ধি করতে পারলেন।

যখন বিজ্ঞানীরা তাঁকে তাঁর এই নতুন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে বললেন, তিনি সকৌতুকে বললেন, কুড়ি বছর পর এর আলোচনা করা যাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠছে নতুন ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েল। আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানানো হল নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবার জন্য।

আইনস্টাইন জানালেন, প্রকৃতির তত্ত্ব কিছু বুঝলেও মানুষ রাজনীতির কিছুই বোঝেন না। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির পদ শুধুমাত্র শোভাবর্ধনের জন্য। শোভা হলেও তাঁর বিবেক যা মানতে পারবে না তাকে তিনি কখনোই সমর্থন করতে পারবেন না।

জীবন শেষ হয়ে আসছিল, এই সময়ে ইংরেজ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অনুরোধে বিশ্বশান্তির জন্য খড়সা লিখতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু শেষ করতে পারলেন না।

১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল তাঁর জীবন শেষ হল। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে মৃতদেহটা পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হল। শোনা যায় পরীক্ষার জন্যে তাঁর ব্রেন কোন গবেষণাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে সম্বন্ধে কেউই আর কোন কথা প্রকাশ করেনি।

Einstein, www.banglainternet.com